রবীন্দ্রনাথের *মেঘদূত*-পাঠ : ক্লাসিক-পাঠের রোমান্টিক পটভূমি

মোহাম্মদ আজম

সারসংক্ষেপ

মেঘদূত কাব্যসহ কালিদাসের অন্যান্য রচনা সারা দুনিয়ায় ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শ হিসাবে পঠিত হয়। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ একজন বিশ্ববিশ্রুত রোমান্টিক গীতিকবি। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কালিদাস পড়েছেন, কালিদাসের রচনায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং *মেঘদূতসহ* তাঁর অন্য রচনার সৃষ্টিশীল ভাষ্য নির্মাণ করেছেন। কালিদাসের সাথে রবীন্দ্রনাথের গভীর সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান রচনায় দেখানো হয়েছে, যতটা বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথের রচনায় ও জীবনাদর্শে কালিদাসের প্রভাব আসলে তার চেয়েও বেশি। বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কালিদাস-পাঠ। দেখানো হয়েছে, একজন রোমান্টিক কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের *মেঘদূত* পড়েছেন রোমান্টিক কাব্যাদর্শের সাথে মিলিয়ে। স্বভাবতই তাতে ক্লাসিক আর রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব আর আগের জায়গায় থাকেনি। রবীন্দ্রনাথের *মেঘদূত*-পাঠ এ কারণেই কেবল এক মহৎ কাব্যের অসামান্য সৃষ্টিশীল পাঠ হয়েই থাকেনি, সাহিত্যতত্ত্বের নতুন দিগন্তও উন্মোচন করেছে।

১

সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে নিশ্চিন্তে বলা যায়, কালিদাস ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম কবি। কালিদাসের কথাই তিনি সবচেয়ে বেশিবার বলেছেন, রচনাবলির বিচিত্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিজের রচনায় দেদার ঋণগ্রহণ করেছেন। 'প্রিয়তম কবি' হওয়াটা যত সরল ও স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়, আদতে অত সরল-স্বাভাবিক নয়। এর নানা ঐতিহাসিক-মনস্তাত্ত্বিক-নন্দনতাত্ত্বিক কার্যকারণ থাকে। যেমন, উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, কবি-স্বভাবে বহু মিল থাকা সত্ত্বেও মধুসূদনের প্রিয়-তালিকায় কালিদাসের স্থান-সঙ্কুলান হয়নি। উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়া আর পশ্চিমায়নের সেই তীব্রতার যুগে কালিদাসে মানস-বসতি গড়ার ফুরসত আসলে মধুসূদন পাননি। মধুসূদনের সহপাঠী-সহমর্মী হিন্দু কলেজের তরুণ যুবাদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন:

> হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারাও ... বলিতে লাগিলেন যে – এক সেল্‌ফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া *Edgeworth's Tales* সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমানায় এ অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। তাঁর নিজের আত্মজীবনী এবং সমকালীন কলকাতানিবাসী বহু কৃতী ব্যক্তির স্মৃতিচারণ থেকে বোঝা যায়, কলকাতায় তখন সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন-পাঠন সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এর দুটি প্রধান কারণ। একদিকে প্রাচ্যবাদী চর্চার নতুন ধারায় প্রধানত ম্যাক্সমুলারের কল্যাণে 'সোনালি ভারতে'র প্রকল্প কলকাতার বাঙালি সমাজে দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছিল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রসারের ফলে 'ভারতীয়ত্ব' আবিষ্কারের নানা উদ্যোগ-আয়োজনও চলছিল। দুই ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ছিল প্রধান অবলম্বন। সংস্কৃত সাহিত্যের এই প্রবল প্রতিষ্ঠার যুগে কালিদাসেরও পরম প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল কলকাতায়; এবং সে সঙ্গে ব্যাপকভাবে পঠিত-অনূদিত-সমাদৃত হয়েছিল *মেঘদূত*।

ভারতীয় ঐতিহ্যে কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে বহু আগে থেকেই স্বীকৃত। ভারতবর্ষে *রামায়ণ* ও *মহাভারতে*র প্রভাব অনেক বেশি। কিন্তু এ দুই কাব্যের রচয়িতাকে একক ব্যক্তি হিসাবে ভাবার অসুবিধা আছে। রবীন্দ্রনাথ *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের 'রামায়ণ' [শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রামায়ণী কথা'র ভূমিকা-স্বরূপে রচিত] প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বস্তুত ব্যাস-বাল্মীকি তো কাহারো নাম ছিল না। ও তো একটা উদ্দেশে নামকরণমাত্র। এতবড়ো বৃহৎ দুইটি গ্রন্থ, আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষ-জোড়া দুইটি কাব্য, তাহাদের নিজের রচয়িতা কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে – কবি আপন কাব্যের এতই অন্তরালে পড়িয়া গেছে।' কিন্তু নামের হদিশ দিয়ে কালিদাসের মাহাত্ম্য বোঝা যাবে না। ক্লাসিকেল ঐতিহ্যে তিনিই একমাত্র লেখক যিনি কাব্য ও নাটকে যুগোত্তীর্ণ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[২] তাঁর রচনা সংস্কৃত ক্লাসিক সাহিত্যরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে প্রথম থেকেই স্বীকৃত। শুধু ভারতবাসী নয়, পশ্চিমা পণ্ডিতেরাও কালিদাসকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করেন।[৩]

এ ধরনের একজন কবি এবং তাঁর খ্যাততম কাব্য রবীন্দ্রনাথের প্রিয় হতেই পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ব্যাপারটার অন্য এক জটিলতা আছে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিশ্রুত গীতিকবি। স্বভাবে 'জন্ম-রোমান্টিক'। তাঁর বিপুল পরিমাণ সাহিত্যতত্ত্বধর্মী আর সমালোচনাধর্মী রচনা সাক্ষ্য দেয়, 'ক্লাসিক' সাহিত্য উপভোগের ক্ষেত্রে তিনি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। স্বদেশী এবং প্রায়-সমকালীন প্রতাপশালী কবি মধুসূদনের সাহিত্য তাঁর ব্যক্তিগত উপভোগের সীমায় এসেছে, এমন প্রমাণ মেলে না। ভারতীয় সাহিত্যকর্ম বাদ দিলে দুনিয়ার অন্য ক্লাসিক সাহিত্যের উল্লেখ তাঁর লেখালেখিতে খুবই কম। এসব তথ্য মনে রাখলে বোঝা যায়, কালিদাস নিয়ে তাঁর আমৃত্যু লিপ্ততা বিস্ময়কর। কালিদাসের সাহিত্য যে তাঁকে এতটা গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করল, তাও কম বিস্ময়ের নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো অতি-ব্যক্তিত্ববান পাঠকের জন্য এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক. তিনি কালিদাস পড়েছেন মন্ময়ভাবে, অর্থাৎ সাবজেক্টিভলি। তন্নিষ্ঠ বা অবজেক্টিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়েননি। তার মানেই হল, তাঁর পাঠ একেবারেই 'খাপছাড়া'। কালিদাসের অন্য বিপুল পরিমাণ পাঠের সাথে বা প্রচলিত-প্রভাবশালী পাঠের সাথে এ পাঠ মিলবে না। দুই. তিনি আসলে কালিদাস পড়েছেন রোমান্টিকের চোখে। তার মানেই হল, তিনি কালিদাস পড়ার এমনসব তরিকা খুঁজে পেয়েছেন অথবা খুঁজে নিয়েছেন, যেগুলো রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির আওতার মধ্যেই ক্লাসিক-সাহিত্য পাঠের সুযোগ তৈয়ার করে। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তাহলে এ ধরনের পাঠ কালিদাস এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই আলোকিত করবে; একই সাথে ক্লাসিক এবং রোমান্টিক সাহিত্যদৃষ্টির সীমাকেও বাড়িয়ে দেবে।

রবীন্দ্রনাথের কালিদাস এবং বিশেষত *মেঘদূত*-পাঠ অবলম্বনে উপরোক্ত দুই সম্ভাবনা পরীক্ষা করাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

২

চৈতালি কাব্যে কালিদাস-স্মরণে লেখা 'ঋতুসংহার', 'কালিদাসের প্রতি' ও 'মানসলোক' নামের তিনটি কবিতা আছে। প্রথম কবিতাটিতে কবি কালিদাসের দুটি প্রধান বিশিষ্টতাকে সম্বোধন করেছেন – তিনি যৌবনের কবি, তিনি প্রকৃতির কবি। কালিদাসের প্রথমদিকের রচনা *ঋতুসংহার* থেকে কবিতার নাম চয়িত হলেও কবিতাটিতে তাঁর সামগ্রিক কাব্যলোকই ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর রচনারাজ্যে অত্যন্ত প্রতাপশালী ছয়টি ঋতুর বর্ণাঢ্যতায় শৃঙ্গাররসের কবি কালিদাস প্রেয়সী-সান্নিধ্যে কল্পকুঞ্জবনে লীলাবিলাসে অভিষিক্ত – এ ধরনের একটা চিত্রের প্রশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে তাঁর সম্মাননা জানিয়েছেন। 'কালিদাসের প্রতি' নামের দ্বিতীয় কবিতায় কবি বর্ণিত হয়েছেন শিবভক্ত কবি হিসাবে। যে উজ্জয়িনী এবং তার রাজ-ঐশ্বর্য কবির ধাত্রী বলে বর্ণিত হয়, রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সেগুলো চিরতরে বিলীন হয়েছে। কেবল স্বর্গীয় বাণীর বদান্যতায় চিরকালীন মহিমা পেয়ে গেছেন স্বয়ং কালিদাস। প্রায় একই ভাব প্রকাশিত হয়েছে 'মানসলোক' কবিতায়ও। এখানে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে 'চিরকবি' অভিধায়।

কবিতা তিনটি তীব্র নয়, কল্পনা আর মূল্যায়নের দিক থেকে তীক্ষ্ণ আর সূক্ষ্মও নয়। তবে তিনটি কবিতা সাক্ষ্য দেয়, কালিদাসকে নিয়ে শতাব্দী-পরম্পরায় যেসব পাঠ তৈরি হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আপত্তি ছিল না। অন্যভাবে বলা যায়, কবিতা তিনটি আসলে 'কবি' অভিধাটিকে বিশেষভাবে – রাবীন্দ্রিক কায়দায় – সংজ্ঞায়িত করেছে। মহত্তম কবি কালিদাস তাতে গৃহীত হয়েছেন দৃষ্টান্ত হিসাবে। কালিদাসের সাহিত্যলোক থেকে নির্বাচিত ভাব চুরি করে তাঁর নামে প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে কাজে খাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রিয় কবির নামে শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনা করেছেন।

তবে কালিদাসের – *মেঘদূত* কাব্যের – সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী পাঠ আছে রবীন্দ্রনাথের আরো আগের এক রচনায়, *মানসী* কাব্যের 'মেঘদূত' কবিতায়। কবিতাটি প্রিয় কবি কালিদাসের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং অতি চরিত্রবান সৃষ্টিশীল পাঠ। ইংরেজ সমালোচক এডোয়ার্ড থম্পসন এ কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন:

> … the poem is his first tribute to Kalidasa. … This first tribute has the impressive charm of confidence. The poet, aged twenty nine, knows that he is India's greatest poet since Kalidasa. If the dead know of such things, the great spirit honoured by this splendid tribute must have been gladdened.[৪]

১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে রচিত কবিতাটির আবহ এবং পরিকল্পনা ভারি সুন্দর। বর্ষাস্নাত এক অপরাহ্ণে কবি বর্ষার কাব্য *মেঘদূত* পড়ছেন। কল্পনা করছেন, কালিদাসও এমন এক বর্ষামুখর সময়ে বিরহ-ভারাতুর হয়ে রচনা করেছিলেন এই বিরহের কাব্য। সে

বিরহও তাঁর একার নয়। দুনিয়ার তাবত মানুষের বিরহভার প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েই বুঝি তিনি রচনা করেছেন *মেঘদূত*। তাই যুগ যুগ ধরে পাঠকেরা নিজেদের অন্তরাত্মার বিচ্ছেদ-গান হিসাবে এই কাব্য পড়ে আসছে। যেমন এখন, এই ঘোর বর্ষণের মুহূর্তে, পড়ছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। আর এ কাব্য পড়া মানে মেঘের সাথে দিগন্তবিস্তৃত বাইরের দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়া। ওই বহিঃপৃথিবী খোদ কালিদাসই গড়েছেন *মেঘদূত* কাব্যের প্রথম খণ্ডে। 'মেঘদূত' কবিতার এ অংশে কালিদাসের নামশব্দ, উচ্চারণভঙ্গি আর ধ্বনিমাহাত্ম্য অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ যে কবিভাষা নির্মাণ করেছেন তা অতুলনীয়:

কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট; কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্যপদমূলে
উপলব্যথিতগতি; বেত্রবতীকূলে
পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে
কোথায় দশার্ণ গ্রাম রয়েছে লুকায়ে
প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা;
পথতরুশাখে কোথা গ্রামবিহঙ্গেরা
বর্ষায় বাঁধিছে নীড়; ... ইত্যাদি

নাটকীয়তা-ঋদ্ধ কবিতাটি শেষ হয়েছে অবশ্য বিচ্ছেদের সুরে – চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে যে দুনিয়া তা থেকে বর্তমানকালের চির-বিচ্ছেদের খবর জানিয়ে। *মেঘদূতের* এ ধরনের সৃষ্টিশীল অভাবনীয় পাঠের নজির আছে কেবল রবীন্দ্রনাথেরই অন্য রচনা 'নববর্ষা'য়।

প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি *মানসীর* 'মেঘদূত' কবিতার গদ্যরূপ-বিশেষ। কালিদাসের কালের সামগ্রিক ঐশ্বর্য থেকে আমাদের যে বিচ্ছেদ ঘটেছে, সে কথাটা এ প্রবন্ধেও আছে। তবে এখানে মানুষের 'চিরবিচ্ছেদচেতনা'র কথাটা বড় হয়ে এসেছে। প্রিয়া-বিচ্ছেদের বিশেষ রূপ এখানে মানুষের অন্তর্নিহিত বিচ্ছেদচেতনার নির্বিশেষ রূপ হিসাবে বিবৃত হয়েছে। আর *মেঘদূত* হয়েছে সেই বিচ্ছেদভারগ্রস্ত মানুষের চিরকালীন আশ্রয়। এ প্রবন্ধে কাব্যটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক উপযোগিতার বয়ান আছে। বলা হয়েছে, পুরানা দুনিয়ার মানবীয় সভ্যতা আর প্রকৃতির ঐশ্বর্য জীবনযাপনের প্রত্যক্ষতায় উপভোগের সুযোগ আমাদের আর নাই। অথচ সেই উপলব্ধি অনুভব করার আকাঙ্ক্ষা আছে, সেই সংবাদ প্রত্যক্ষ করার বাসনা আছে। *মেঘদূত* সেই বাসনার চিরকালীন আশ্রয়।

কালিদাস ও *মেঘদূত* নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট লিখেছেন। নানা আঙ্গিকে লিখেছেন। এরমধ্যে *বিচিত্র প্রবন্ধ* বইয়ের 'নববর্ষা'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের সৃষ্টিশীল এবং লিপ্ত পাঠ, সমালোচনা এবং সাহিত্যতত্ত্ব – এসব বর্গের হিসাবে এ প্রবন্ধ তুলনাহীন। নির্মেদ ও গতিশীল প্রবন্ধটির প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ মানুষের জীবনযাত্রার একটা গভীর সত্য এঁকেছেন। বলেছেন, প্রাত্যহিকতা আবেগের ও অনুভূতির সৌন্দর্য নষ্ট করে। চারপাশের নিত্য সংযোগ জল-স্থলের কোনো উপাদানকেই 'অ-সাধারণ' থাকতে দেয় না। হয়ত অসাধারণের প্রতি আগ্রহী হওয়ার সম্ভাবনাও নষ্ট করে দেয়। আকাশের মেঘকে তিনি আবিষ্কার করেছেন এই প্রাত্যহিকতার বাইরের জিনিস হিসাবে। আর সে কারণেই, তাঁর মতে, মেঘ মানুষকে নিত্যতার বন্ধন ছেড়ে অনিত্যের মুক্তিতে আহবান করতে পারে। মন তাতে সহজেই সাড়া দেয়। সে বেরিয়ে পড়ে বাইরের অচেনা দুনিয়ায়। মন অসঙ্কোচে বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারে, তার এক কারণ বন্ধনমুক্তি, অন্য কারণ অপ্রাপণীয় অসীমের সাথে মিলিত হওয়ার তীব্র বাসনা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, বেরিয়ে পড়ার বন্ধনমুক্তি আর মিলনের সংযুক্তি – দুই আকাঙ্ক্ষারই আশকারা দেয় ওই এক মেঘ। কারণ, অনিত্যতাই তার মূল স্বভাব।

'নববর্ষা' প্রবন্ধে এই অযৌক্তিক যুক্তির দুর্দান্ত শৃঙ্খলায় রবীন্দ্রনাথ *মেঘদূত* পাঠ করেছেন। 'পূর্বমেঘ' তাঁর কাছে 'অচেনা দুনিয়া'য় স্বেচ্ছা-বিহারের বিলাস; আর 'উত্তরমেঘ' চিরমিলনের উচ্চাভিলাষ। এই শনাক্তির পর তিনি অনায়াসেই উপনীত হয়েছেন এক সার্বিক সাহিত্যতত্ত্বে। বলেছেন, প্রত্যেক শিল্পকর্মেই আছে এক 'পূর্বমেঘ' আর এক 'উত্তরমেঘ'। 'পূর্বমেঘ' পাঠককে নতুন দুনিয়ায় আহবান

করে আনে। আর 'উত্তরমেঘ' আশ্বাস দেয় যে, কবি-রচিত নতুন দুনিয়ায় বিহার ব্যর্থ হবে না। এই পাঠ তাকে পৌঁছে দেবে কোনো প্রাপ্তিযোগের আনন্দময় অভিজ্ঞতায়। নিঃসন্দেহে *মেঘদূত* স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জন্য এ ধরনের উৎকৃষ্ট আনন্দযোগের কারণ হয়েছিল।

৩

মেঘদূত পাঠের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা বোঝার জন্য কাব্যটির অপরাপর প্রভাবশালী পাঠ সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া দরকার। দেখা যাচ্ছে, কাব্যটির মহিমা সম্পর্কে এক ধরনের সর্বসম্মতি আছে। তবে প্রভাবশালী বয়ানগুলোতে জোর পড়েছে মূলত কালিদাসের কাব্যকৌশলের উপর। কাব্যের আঙ্গিক, বিবরণের ধরন, আলঙ্কারিকতা, ঐশ্বর্য এবং আভিজাত্যই প্রাধান্য পেয়েছে। রসের কথাটা আছে; তবে বড় হয়ে উঠেছে রস পরিবেশনের মার্জিত ও কার্যকর ভঙ্গি। তাতে অলোকসামান্য কাব্য হিসাবে *মেঘদূতের* চরম প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

১৮১৩ সালে উইলসন *মেঘদূতের* ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। এ বইয়ের ভূমিকায় তিনি লক্ষ করেছেন, সংস্কৃত সাহিত্যের স্বভাবসুলভ বাগাড়ম্বর, আলঙ্কারিকতার আতিশয্য এবং বিবরণের অমিতাচার থেকে এ কাব্য স্পষ্টতই ব্যতিক্রম।[৫] এই স্বীকৃতি আসলে পুরানা সংস্কৃত সাহিত্যতাত্ত্বিক গ্রন্থাবলিতেও লভ্য। সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বে *মেঘদূত* বিরামহীন উদ্ধৃত হয়েছে অলঙ্কার, ছন্দ, কবিভাষার বিশিষ্টতা আর কাব্যের আভিজাত্যের দৃষ্টান্ত হিসাবে।[৬] এ কাব্যের পরিকল্পনাই বিশেষভাবে দৃষ্টি-আকর্ষক। বিখ্যাত ভাষ্যকার মল্লিনাথ যেমন জানিয়েছেন, *রামায়ণ* থেকে কালিদাস হয়ত একটা প্রাথমিক সূত্র পেয়েছেন – রাম সীতার কাছে হনুমানকে দূত করে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু কাব্যের পুরো পরিকল্পনাটি কবির নিজস্ব। পৌরাণিক বা প্রচলিত কাহিনির অনুবর্তন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এ কাব্য বরং সৃষ্টি করেছিল এক প্রভাবশালী সন্দেশকাব্য বা দূতকাব্যের ধারা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষ্যকাররা কাব্যটিকে রেখেছেন প্রধানত খণ্ডকাব্য বর্গে, আর একে সাব্যস্ত করেছেন 'the crest-jewel of Khanda-kavyas'[৭] হিসাবে।

মেঘদূতের ভাষা ও ভঙ্গির কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন সমালোচকেরা। কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যের কৃত্রিম যুগের কবি।[৮] এ অর্থে যে, প্রাত্যহিক ব্যবহারে ভাষার যে স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গি আর সচলতা জায়মান থাকে, ওই যুগে সংস্কৃতের সে সচলতা ছিল না। কালিদাসও বিশেষভাবে তাঁর অলঙ্কার-চাঞ্চল্য আর ভাষার সমৃদ্ধ শোভমানতার জন্য খ্যাতিমান। অথচ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রভাবশালী পাঠকসমাজ *মেঘদূতের* ভাষায় লক্ষ করেছেন সারল্য আর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা। বলেছেন, এ কাব্যের বিবরণ সূক্ষ্ম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ, সরল কিন্তু মার্জিত[৯]; এ কাব্যে পুরাণের শৈথিল্য আর পরবর্তীকালীন কাব্যের আতিশয্য নাই; লম্বা যৌগিক শব্দ, অলঙ্কারবাহুল্য আর কৃত্রিম শ্লেষ থেকেও তা মুক্ত[১০]; নির্বাচিত সরল শব্দের বিন্যাসে অসাধারণ বাকবিভূতিসম্পন্ন – 'Kalidasa is noted for simplicity, directness, clarity, elegance and felicity of expression'[১১]। এই 'সরল' ভাষাতেই তিনি সম্ভবপর করেছেন যুগদুর্লভ ঐশ্বর্য আর আভিজাত্য। *মেঘদূতের* জগৎ ভোগে ও ঐশ্বর্যে দ্যুতিময়, ইন্দ্রিয়বিলাসে ভরপুর। তিনি বর্ণনা করেছেন কাল্পনিক দেবনিবাস অলকা আর – সম্ভবত – সমকালীন বাস্তব নগর উজ্জয়িনী। বর্ণনা করেছেন ভারতের বিশাল ভূগোল আর প্রকৃতি। তাঁর নগর, মানুষ ও প্রকৃতি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এক আনন্দময় উপস্থিতি। মনুষ্যনির্মিত ঐশ্বর্য আর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের যে অমিত সমন্বয় *মেঘদূতে* ঘটেছে, তার তুলনা সাহিত্যে বিরল:

> Kalidasa's genius lies in his ability to combine sublimity with grace, the rhythm's power of music with the language's power of expression, the boldness of description with the magnificence of sensuous colour in a degree of perfection never before or afterwards surpassed or even equaled in poetic literature.[১২]

মেঘদূত সাধারণত পঠিত হয় বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গার বা বিরহ-প্রেম রসের কাব্য হিসাবে। শুধু 'যৌন প্রণয়কে অবলম্বন করে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর দীর্ঘ কবিতা পৃথিবীতে আর রচিত হয়নি'।[১৩] এ কাব্যের প্রতিটি শ্লোক, প্রতিটি উপাদান আর অন্বয় এ রসেরই পোষকতা করেছে।[১৪] রাও উদাহরণ হিসাবে 'স্নিগ্ধছায়াতরু' শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন। 'স্নিগ্ধ' শব্দটি কেবল অরণ্যের প্রগাঢ়তাই বোঝায় না, 'গাছ' এবং 'ছায়া'র মতো নিরাবেগ উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের নিবিড়তাও প্রকাশ করে। স্ত্রীবাচক শব্দ 'ছায়া'র সাথে বেছে নেয়া হয়েছে পুরুষবাচক 'তরু', আর এমন এক অনুভূতি সঞ্চার করা হয়েছে যে, সমগ্র প্রকৃতিই পরস্পর রতি-ভাবে সম্পর্কিত। *মেঘদূতের* ইমেজ যৌনভাবাপন্ন; কিন্তু সমালোচকেরা বিরামহীনভাবে এর সুমিতি ও সুরুচির কথা বলেছেন। বলেছেন, এমন ইন্দ্রিয়ঘন বিবরণী এমন মহিমা আর কখনোই অর্জন করেনি; আর কোথাও পার্থিব বয়ান অপার্থিব আকুতির এই শোভা ধারণ

করেনি।[১৫] এমনকি বুদ্ধদেব বসু, এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় সমালোচনাপ্রবণ হয়েও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, 'কামের এই বিশ্বরূপ পৃথিবীর অন্য কোনো কাব্য আমাদের দেখাতে পারেনি'।[১৬]

৪

মেঘদূত কাব্যের বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য পাঠের প্রতিনিধি-স্থানীয় সামান্য অংশই কেবল উপরে উদ্ধৃত হল। এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, কাব্যটি পঠিত হয় মূলত 'ক্লাসিক' কাব্য হিসাবে। ক্লাসিক কথাটা সাহিত্যে-সমালোচনায় নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিছু অর্থ জনপ্রিয় হয়েছে সতের-আঠার শতকের ইংরেজি সাহিত্যের নিওক্লাসিক সাহিত্যদৃষ্টির কল্যাণে। এর পরপরই রোমান্টিক সাহিত্য-আন্দোলন জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় এবং রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শের মূল উপাদানগুলো নিওক্লাসিক আদর্শের বিপরীতে স্থাপন করায়, রোমান্টিকতার বিপরীত আদর্শ হিসাবে ক্লাসিককে দেখা বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্লাসিকের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দাঁড়ায় – ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য; ভাষা এবং সাহিত্যশৈলীর ক্ষেত্রে কৃত্রিম-নিরূপিত-শৈল্পিক আদর্শকে মূল্য দেয়া; সাহিত্যের বিষয় আর শিল্পবোধের ক্ষেত্রে মানুষের গড় বৈশিষ্ট্যকে বড় করে দেখা; সাহিত্য রচনা ও পাঠের ক্ষেত্রে 'শিক্ষিত-মার্জিত' উন্নত রুচির বরাত প্রধান হয়ে ওঠা ইত্যাদি।[১৭] বুদ্ধদেব বসু সংস্কৃত সাহিত্যের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ধরতে চেয়েছেন নিম্নোক্ত শব্দরাশিতে:

> ... পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল, প্রচলনির্ভর; ভঙ্গিপ্রধান ও বর্ণনাপ্রধান; সাবধানী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন; সদ্ব্যয়ী, সতর্ক, সৌষম্যযুক্ত; আচারনিষ্ঠ ও প্রতিমাপূজক; অমত্ত, শিষ্টভাষী, সামাজিক ও আমাদের পক্ষে সুদূর; বিস্তারধর্মী, অলংকারমণ্ডিত, শোভমান; কল্লোলিত, প্রোজ্জ্বল ও নিস্তাপ ...[১৮]

বসুর বিবরণীতে খানিকটা উন্নাসিকতা বা নেতিবাচকতা আছে। সেটুকু বাদ দিলে এই শব্দমালাকে সার্বিকভাবে ক্লাসিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক হিসাবে নেয়া যেতে পারে। *মেঘদূত* কাব্য দুনিয়াজুড়ে এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পঠিত হয়, যার কিছু নমুনামাত্র উপরে উল্লেখিত হয়েছে। আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে জরুরি তথ্য হল, রবীন্দ্রনাথের বিপুল *মেঘদূত*-পাঠের সাথে এই দৃষ্টিভঙ্গি বা পদ্ধতির প্রায় কোনোই মিল নাই।

প্রথমেই আমাদের নজরে পড়বে, রবীন্দ্রনাথ *মেঘদূতের* শরীরী-প্রতিভা নিয়ে খুব কমই বিচলিত ছিলেন। তিনি এমনকি বিবরণীর আক্ষরিক বা ব্যঞ্জনার্থকেও আমলে আনেননি। তাঁর মূল ঝোঁক ছিল আরো এক ধাপ গভীরে পুরো কাব্যটি সামগ্রিক যে আবেদন তৈরি করে, তা খতিয়ে দেখা। অন্যভাবে বলা যায়, কাব্যের শব্দসঞ্চয় কিংবা উপকরণ বিন্যাসের পেছনে যে বিমূর্ত ধারণা অগোচরে কাজ করে যায়, বা শব্দ ও উপকরণের বিশিষ্ট বিন্যাসের পর এগুলোর অতিরিক্ত অভাবনীয় যে বিমূর্ত বোধ ফুটে ওঠে, তা চিহ্নিত করা। তার মানে এ নয় যে, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যের অসামান্য শরীরী প্রতিভার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। মোটেই তা নয়। তাঁর অন্য রচনায় এ প্রসঙ্গে কয়েকটি মন্তব্য পাওয়া যায়।

ছন্দ গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসাবে সংযোজিত 'বাংলা শব্দ ও ছন্দ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, 'মেঘদূত সুরে বসানো বাহুল্য'। এ মন্তব্যের কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। সার্বিকভাবে সংস্কৃত কাব্যের এবং বিশেষত *মেঘদূতের* ছন্দ ও ধ্বনিগৌরব এতই যথেষ্ট যে তার অর্থব্যাপ্তির জন্য আলাদা সুর দরকার নেই। অন্যত্র *বাংলাভাষা-পরিচয়* গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদে *মেঘদূতের* ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: 'মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এ কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু।' *সাহিত্যের স্বরূপ* গ্রন্থের 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন *মেঘদূতের* সামগ্রিক শ্রী-ছাঁদ নিয়ে: 'মেঘদূত কাব্যটি প্রাণবান, আপনার মধ্যে ওর সামঞ্জস্য সুপরিমিত। ... রঘুবংশ-কাব্য আপন ভারবাহুল্যে অভিভূত, মেঘদূতের মতো তাতে রূপের সম্পূর্ণতা নেই।' এই তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ *মেঘদূতের* শরীরী প্রতিভা সম্পর্কে নিগূঢ়ভাবে সচেতন ছিলেন। কিন্তু একে তিনি কাব্যের লক্ষ্য মনে করতেন না, উপায় মনে করতেন মাত্র। কাব্যপাঠের ক্ষেত্রে তিনি লক্ষ্যকেই সামনে আনতে চেয়েছেন।

ক্লাসিকের বৈশিষ্ট্য এবং ক্লাসিক পাঠের রীতি-রেওয়াজের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপরে দেয়া হয়েছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি খাপ খায় না। সৌভাগ্যক্রমে ক্লাসিকের আরো কিছু প্রভাবশালী বয়ান আমাদের হাতে আছে, যা থেকে অন্য রকম সিদ্ধান্ত সম্ভব। প্রথমেই উল্লেখ করা যাক সাঁত বভের মন্তব্য:

> A true classic, as I should like to hear it defined, is an author who has enriched the human mind, increased its treasure, and caused it to advance a step; who has discovered some moral and not equivocal truth, or revealed some eternal passion in that heart where all seemed known and discovered; who has expressed his thought, observation, or invention, in no matter what form, only provided it be broad and great, refined and sensible, sane and beautiful in itself; who has spoken to all in his own peculiar style, a style which is found to be also that of the whole world, a style new without neologism, new and old, easily contemporary with all time.[১৯]

বভের বিখ্যাত 'What is a classic?'[1850] প্রবন্ধের এ সংজ্ঞায় দশের কথা আছে, কিন্তু এক গুরুত্ব হারায়নি; চিরকালের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সমকাল সেখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বরং প্রত্যেক সমকালে সমকালীন হয়ে ওঠাই, বভের মতে, ক্লাসিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বভের এই সংজ্ঞায়ন দারুণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। একই রকম বা তারচেয়েও বেশি মিলবে ইতালো কালভিনোর বিশ্লেষণ।

ইতালীয় কথাসাহিত্যিক-তাত্ত্বিক ইতালো কালভিনো *Why Read the Classics?* [1991] গ্রন্থের গ্রন্থনামাঙ্কিত প্রথম প্রবন্ধে ক্লাসিক কিভাবে বা কেন পঠিত হয় ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর তালাশ করতে গিয়ে খোদ ক্লাসিকের দারুণ সব সংজ্ঞা দিয়েছেন, বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। বলেছেন, ক্লাসিক বারবার পড়া যায়; প্রতি পাঠেই নতুন মনে হয়; প্রথমবার পড়ার সময়েই পরিচিত গ্রন্থ পড়ার অনুভূতি পাওয়া যায়; সংস্কৃতির গড়নে যার প্রভাব নিত্য অনুভূত হয় ইত্যাদি। বৈশিষ্ট্যগুলোতে সামষ্টিক অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রাধান্য আছে। সবার জন্য এবং চিরকালের জন্য – এ ধরনের ছাঁচে সম্ভবত তাঁর অধিকাংশ কথাকে বেঁধে ফেলা যাবে। তবে মোট চোদ্দটি পয়েন্টের একটি বিশেষভাবে চাঞ্চল্যকর এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক: ''Your' classic is a book to which you cannot remain indifferent, and which helps you define yourself in relation or even in opposition to it'.[২০] রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন কুশলী পাঠক নন, নিজেই মহাকবি। তাঁর কবিতায় সংস্কৃত সাহিত্য এবং বিশেষত কালিদাসের গভীর প্রভাবের কথা মনে রাখলে সহজেই সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, তাঁর নিজেরই একজন কালিদাস ছিল এবং সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রে তিনি সেই নিজস্ব কালিদাসেরই ভজনা করেছেন। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের *মেঘদূত*-পাঠ আসলে তাঁর নিজের সাহিত্যবোধ ও তত্ত্বের এক অনুপম প্রদর্শনী। সে তদন্তে যাওয়ার আগে রবীন্দ্র-মানসে কালিদাসের প্রভাব সম্পর্কে একপ্রস্ত জরিপ চালানো দরকার।

৫

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে এবং সামগ্রিক ভাব-পরিমণ্ডলে কালিদাসের প্রভাব আক্ষরিক অর্থেই অপরিমেয়। বস্তুত তাঁর আগে কিংবা পরে আর কোনো সাহিত্যিক কালিদাসের ভাবধারাকে আত্মসাৎ করে এমন বিচিত্র মাত্রায় কাজে লাগাতে পারেননি।[২১] এ প্রভাবের একাংশমাত্র প্রত্যক্ষত সাব্যস্ত করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কালিদাসের, বিশেষত *মেঘদূতের*, শব্দ ও বাণীভঙ্গি হুবহু নিজের কাব্যে ব্যবহার করেছেন, তা নজিরবিহীন। এর বাইরে বড় প্রভাব পড়েছে 'ভারতে'র সংজ্ঞায়নে, প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক নিরূপণে এবং সমাজ ও রাজনীতির আদর্শ নির্ধারণে। আগেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কালে কলকাতায় কালিদাসের প্রবল প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। ঠাকুরবাড়ির কালিদাসচর্চাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর দুই ভাই – দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ – *মেঘদূতের* পদ্যানুবাদ করেছিলেন। অন্য ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন নাটক। শিশু রবীন্দ্রনাথ কণ্ঠস্থ করেছিলেন কালিদাসের একাধিক কাব্য। ওই শিশুবয়সের চর্চায় ভাবে-রূপে-সুরে কালিদাস যেভাবে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লীন সত্তায় মিশে গিয়েছিল, মাত্রাগত হেরফের সত্ত্বেও, তা শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। স্পষ্টতই কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথে এক নিবিড় পারস্পরিকতা নির্মিত হয়েছে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় পাঠ ও পুনঃসৃজন কালিদাসকে নতুন করে উপস্থাপন করেছে, আর কালিদাসের কাব্যালোকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে *মেঘদূতের* প্রভাবই সর্বাপেক্ষা প্রবল। *মেঘদূত* সৌন্দর্যের এক অনাবিল প্রদর্শনী। এ সৌন্দর্য বস্তুর বহিরঙ্গের, মানব-মানবীর যৌবনের আর প্রকৃতির অনন্ত সচ্ছলতার। এই সমৃদ্ধি আর সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে। নিজের কালে বর্তমানের প্রচণ্ডতায় অনুরূপ উপলব্ধির সুযোগ রবীন্দ্রনাথের ছিল না। যুগের সমৃদ্ধি আর নানামাত্রিক আনুকূল্য একজন কবিকে যেভাবে শব্দসঞ্চয়ের বর্ণাঢ্যতায় সিক্ত করে, রবীন্দ্রনাথ সেই আশকারা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু কালিদাসের

জগতের সমৃদ্ধির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। এ কারণেই তিনি অবলম্বন করেছেন এক অনন্য কাব্যকৌশল। কালিদাসের শব্দ, বাকভঙ্গি আর চিত্র আত্মসাৎ করে তিনি অনুরূপ আবহ তৈরি করতে চেয়েছেন। *মানসী*র 'মেঘদূত' কবিতায় এ প্রসঙ্গের কথা আগেই বলা হয়েছে। *কল্পনা* কাব্যের অনেকগুলো কবিতায় তিনি এ কাব্যকৌশল অবলম্বন করেছেন। 'বর্ষামঙ্গল' কবিতার কয়েকটি ছত্র নিম্নরূপ:

কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিকললনা,
জনপদবধূ তড়িৎচকিতলোচনা,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!

ঘনবনতলে এসো ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা!

এখানে বর্ষাযাপনের বিচিত্র এনতেজাম কয়েকটি চরিত্র, বাদ্যযন্ত্র আর ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কবি কালিদাসের উপর নির্ভর করেছেন। বর্তমানের সাপেক্ষে চিত্রগুলো বাস্তবসম্মত নয়। এগুলোর পুনরুৎপাদনও সম্ভব নয়। কিন্তু কালিদাসের বর্ণাঢ্য কাব্যলোকের সাপেক্ষে স্মৃতি ও আকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয়ে চিত্রগুলো অসাধারণ তাৎপর্যে মহিমান্বিত হয়েছে। এ ধরনের প্রত্যক্ষ চিত্রের বাইরে পরোক্ষ চিত্রও আছে প্রচুর। *চিত্রা* কাব্যটি আদর্শ সৌন্দর্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খ্যাতিমান। এ কাব্যের 'বিজয়িনী' কবিতায় প্রকৃতির বিপুল প্রেক্ষাপটে মানবীচিত্রের আদর্শ সৌন্দর্য অঙ্কিত হয়েছে। সাদা চোখেই ধরা পড়ে, সুগভীর নির্জনতা, জনরিক্ত নীরবতা আর সুষম প্রকৃতির বলিষ্ঠ উপস্থিতির এই ছবি প্রাচীন কাব্যজগতেরই সৃষ্টিশীল পুনরুৎপাদন। কালিদাসের কাব্যলোক ছেনে-পাওয়া শান্তরসাস্পদ নিবিড়তায় কবি এক যৌবনবতী রমণীকে অবলম্বন করে সৌন্দর্যের ধ্যানী মূর্তি এঁকেছেন। এ ধরনের শান্তরসসিক্ত আবহ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যথেষ্ট আছে।

'কালিদাস যে সৌন্দর্যের রাজ্যে বসবাস করতেন, রবীন্দ্রনাথ সেই সৌন্দর্যের রাজ্যে গমন করেছেন স্বপ্নে ও কল্পনায় অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সৌন্দর্যের রাজ্যে গমন একটা সাময়িক আনন্দময় অভিসারের মতো'।[২২] ফলে এর মধ্যে একটা বেদনার দিকও আছে। এই বেদনা কাম্যকে বাস্তবে না পাওয়ার বেদনা। *কল্পনা* কাব্যের বিখ্যাত 'স্বপ্ন' কবিতায় একই সাথে আনন্দময় অভিসার আর স্বপ্নভঙ্গের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। কবি বহুদূরে উজ্জয়িনীপুরে শিপ্রানদীতীরে তাঁর প্রিয়ার অনুসন্ধানে গেছেন। প্রিয়ার সাথে দেখাও হয়েছে। কালিদাসের বিচিত্র অনুষঙ্গে সাজানো আবহে কালিদাসের কাব্যের নায়িকা মূর্তিমান হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকে। 'কবি প্রাচীনকালের দয়িতাকে একান্তভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ভাষাগত ও কালগত ব্যবধান থেকে তাকে নিবিড় করে পাওয়া সম্ভবপর নয়'।[২৩] এই বিশেষ অপ্রাপ্তিজনিত বিষাদ রবীন্দ্রনাথের অন্তত প্রথম যুগের সাহিত্যের অন্যতম প্রধান সম্পদ।

রবীন্দ্রনাথ 'ভারতে'র ধারণা আবিষ্কার করেছিলেন প্রধানত কালিদাসের কাব্য থেকে। এক প্রাচীন ভারত, সোনালি ঐতিহ্যের ভারত তাঁকে আমৃত্যু আবিষ্ট করে রেখেছিল। তিনি রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তাঁর প্রায় যাবতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক সন্দর্ভ রচনা করেছিলেন। এর বৈধতা তিনি পেয়েছিলেন পুরানা ভারতের জনজীবনের সামঞ্জস্যের ধারণা থেকে। কালিদাস ছাড়া আর কেই-বা এই মোহনীয় জীবনবৈভবের নিশ্চয়তা দিতে পারত? অধিকাংশ তাত্ত্বিক কালিদাসকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর স্বর্ণযুগের কবি মনে করেন। শুধু ঐশ্বর্যে নয়, অন্তর্গত দার্শনিকতায়, ধর্মীয় বোধ আর জনজীবনের গভীর আদর্শ রচনায় কালিদাস গুপ্ত-স্বর্ণযুগের বার্তাবাহী।[২৪] এই মতের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কোনো সংশয় ছিল না। কৃষ্ণ চন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন,[২৫] মেঘদূতের জগৎ এক নিয়মানুগ জগৎ। পার্থিব এবং স্বর্গীয় – সবই এখানে নিয়মানুগ। নৈতিকতা নন্দনের বশীভূত। ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সূক্ষ্মতা আর

আভিজাত্যের বলে পরিণত হয় সুখকর উল্লাসে। এ ধরনের এক সামঞ্জস্যপূর্ণ দুনিয়ার হদিশ রবীন্দ্রনাথকে কেবল কালিদাসই জোগাতে পেরেছে। তপোবনের ধারণা সেই দুনিয়ার পরম আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন ভারত আসলে তপোবনের ভারত। *আত্মপরিচয়* গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমি আশ্রমের আদর্শ-রূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাইনি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই।' এ কাব্য প্রধানত কালিদাসেরই কাব্য। কালিদাসের আশ্রম সংস্কৃত সাহিত্যিক ঐতিহ্যের অন্য আশ্রমের মতো নয়। গুপ্তযুগে আশ্রমবাসীরা ধর্মীয় আচার আর আর্থিক কর্মকাণ্ডে গৃহী মানুষদের চেয়ে আলাদা ছিল, কিন্তু সামাজিক রীতিতে নয়।[২৬] এ ধরনের আশ্রম-জীবনেই কালিদাস মানুষ ও প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সমন্বিত জীবন খুঁজে পেয়েছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন তাঁর আদর্শ 'ভারত'। এই ভারতের দুটো প্রধান দিক। একদিকে ভোগ ও ত্যাগের সমন্বিত মহিমা, অন্যদিকে প্রকৃতি আর মানুষের গভীর পারম্পর্য। *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে প্রথম দিকটির তাৎপর্যপূর্ণ নির্দেশনা আছে, আর ওই একই গ্রন্থের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে আছে দ্বিতীয় দিকের চরিত্রবান সূত্রায়ণ। তবে কালিদাস অবলম্বনেই এ দুই বিষয়ে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ দার্শনিকতা-আশ্রয়ী আলোচনা আছে *শান্তিনিকেতন* বইয়ের নবম অধ্যায়ে।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের কেবল সৃষ্টিশীল সত্তা নয়, কাঙ্ক্ষিত জীবনবোধ আর যাপনরীতির সাথে কালিদাসের গভীর একাত্মতা ছিল। কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট কালিদাস ছিল আসলে তাঁর ইতালো কালভিনো-কথিত 'নিজের ক্লাসিক'।

৬

এ দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের *মেঘদূত*-পাঠ তাঁর শিল্পীসত্তারই অন্তরঙ্গ উন্মোচন। এই শিল্পীসত্তার বৈশিষ্ট্য হিসাবে পশ্চিমা অর্থে 'রোমান্টিক' কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটি রবীন্দ্রনাথের লেখক-স্বভাব অনেকদূর পর্যন্ত প্রকাশ করে। ১৮০০ সালে ওয়ার্ডওয়ার্থ *লিরিকেল ব্যালাডে*র লম্বা ভূমিকা-প্রবন্ধ প্রচার করেছিলেন।[২৭] রোমান্টিক আন্দোলনের মেনিফেস্টো হিসাবে পরিচিত প্রবন্ধটিতে তিনি জোর দেন কবিতায় ব্যক্তির তীব্র আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের উপর; প্রকৃতিলিপ্ততাকে চিহ্নিত করেন কবিতার গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হিসাবে; সাধারণ মানুষের জীবন আর ভাষাকে কবিতায় অবলম্বনের কথা বলেন; আর প্রচলিত ও বাস্তবের যুক্তি নয়, বরং ব্যক্তির কল্পনাপ্রতিভার সর্বোত্তম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সর্বজনীন ও চিরকালীন অনুভবের প্রকাশকেই উৎকৃষ্ট কবিতার লক্ষণ হিসাবে ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল সত্তায় এ উপাদানগুলোর প্রাধান্য সুবিদিত। *মেঘদূত*-পাঠের ক্ষেত্রেও তিনি এ উপাদানের কোনো-কোনোটি হয় আবিষ্কার করেছেন অথবা এগুলোর সাপেক্ষেই কাব্যটি পড়তে চেয়েছেন।

প্রথমেই চোখে পড়বে, কবি *মেঘদূত* পড়তে চেয়েছেন বিরহের কাব্য হিসাবে। খণ্ডকাব্য নয়, কাহিনিকাব্য নয়, প্রেমকাব্য নয়, ইন্দ্রিয়ভারাতুর কামকাব্য তো নয়ই, মানুষের চিরন্তন বিরহের অনুভূতিই, তাঁর মতে, কাব্যটির মূল আবহ। সেই বিরহ আবার কেবল যক্ষের নয়, রচয়িতা-কবিরও নয়, বরং 'বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক' বহন করছে এই অমর কাব্য। *মানসী*র 'মেঘদূত' কবিতায় কবি 'পূর্বমেঘে'র বিপুল দুনিয়াকে দেখেছেন কল্পনার বিস্তার হিসাবে। কেবল রচয়িতার জন্য নয়, সর্বকালের পাঠকের জন্যও বটে। মেঘের বিস্তৃত গমনপথের সাক্ষ্য ধরে সমালোচকেরা কালিদাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রশস্তি গেয়েছেন, বলেছেন, হয় নিজে ভ্রমণ করে অথবা অন্যের ভ্রমণকাহিনি পড়ে কালিদাস এ জ্ঞান হাসিল করেছেন, সম্ভব করে তুলেছেন নিখুঁত বিবরণী। আর রবীন্দ্রনাথ একে দেখেছেন কল্পনার বর্ণাঢ্য সমারোহে স্বেচ্ছাবিহারের সুযোগ হিসাবে। কিন্তু বিহারই তাঁর কাছে শেষ কথা নয়। এর মধ্য দিয়েই পৌঁছানো যাবে কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরীতে। সেখানে সৌন্দর্যের মাঝে চিরবিরহের বেশে কাল যাপন করছে চিরবিরহিণী। এই বিরহ শেষ হওয়ার নয়। 'মেঘদূত' কবিতাটি তাই শেষ হয়েছে একগুচ্ছ প্রশ্নবিদ্ধ হাহাকারে। যে অমৃতলোক মানুষের অগম্য, তার এরকম বাস্তব মূর্তি এঁকে কালিদাসের *মেঘদূত* আসলে অপ্রাপণীয়ের জন্য হাহাকারকে চিরস্থায়ী করে গেল।

প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে আরেক ধরনের অপ্রাপ্তির যন্ত্রণার কথা আছে। তিনি লিখেছেন, 'আবার সেই প্রাচীন ভারতখণ্ডটুকুর নদী-গিরি-নগরীর নামগুলিই বা কী সুন্দর!' তাঁর মতে, নামগুলোর মধ্যে শোভা-সম্ভ্রম-শুভ্রতা আছে। এই গুণগুলো ক্রমেই আমরা হারিয়েছি। তাহলে বর্তমানের দীনতার বিপরীতে তিনি পড়ছেন প্রাচীন ভারতকে, আর সেই ভারতের পরম আশ্রয়

কালিদাসের *মেঘদূতকে*। বর্তমান স্থান আর কালের ব্যাপারে অনীহা এবং তার বিপরীতে সুদূর স্থান-কালের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা রোমান্টিক স্বভাবের কুললক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনায় এই স্বভাব চিহ্নিত-চিত্রিত হয়েছে প্রধানত প্রাচীন ভারতের দুর্লভ ঐশ্বর্যের কল্পনায়।

কালিদাস যে দূতকে মেঘ হিসাবে কল্পনা করেছেন, তার কারণ কাব্যে পরিষ্কার নয়। তবে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মেঘ যে সবচেয়ে ভালো নির্বাচন ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কালিদাস অবশ্য বিরহী মানুষের উপর মেঘের অপরিমেয় প্রভাবের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্য এই সূত্রটিই যথেষ্ট ছিল। তিনি নিজে বর্ষার কবি। তিনি নিজে মেঘের বিশিষ্ট রূপকার। 'নববর্ষা' প্রবন্ধে মেঘের যে অভূতপূর্ব সংজ্ঞায়ন, তাতে কালিদাসের ভাগ কতটা আর রবীন্দ্রনাথের নিজের কতটা, তা নির্ধারণ খুব সহজ নয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, চিরন্তন অনিত্যতার চমৎকার উদাহরণ হিসাবে মেঘকে প্রতিষ্ঠা করে *মেঘদূত* পাঠের যে রেওয়াজ রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করলেন, তাতে তাঁর রোমান্টিক দৃষ্টি যেমন অটুট থেকেছে তেমনি ক্লাসিক সাহিত্যের মহিমাও সমুজ্জ্বল হয়েছে।

কথাটা আরেকটু ব্যাখ্যা করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।' 'নববর্ষার কাব্য' দরকার, কারণ প্রথম মেঘের সাথে তাবত মানুষের মুক্তির সম্পর্ক – নিত্যতার ক্ষুদ্রতা এবং প্রাত্যহিকতার বন্দীদশা থেকে মুক্তি। এরপর রবীন্দ্রনাথ যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, তারমধ্যে 'কোনো সাহিত্যে', 'কোথাও', 'সমস্ত', 'নিত্যকালের', 'অনির্বচনীয়', 'মানবের ভাষা' ইত্যাদি শব্দের দিকে নজর না দিয়ে পারা যায় না। স্পষ্টতই এসব দাবি 'ক্লাসিক' সাহিত্যের দাবি। তবে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবধারার সাথে এগুলোর কোনো বিরোধ নাই। এটা সুবিদিত যে, রবীন্দ্রসাহিত্যে বর্তমানের তুলনায় চিরকালের, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তুলনায় ইন্দ্রিয়াতীতের, বিশেষের তুলনায় নির্বিশেষের আর নিত্যের তুলনায় অনিত্যের প্রতাপ প্রবল।[২৮] 'নববর্ষা' প্রবন্ধে তিনি মেঘকে এসব বৈশিষ্ট্যের এক অতুলনীয় বাহক-রূপে গ্রহণযোগ্য করেছেন, এবং আশ্চর্য কৌশলে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্লাসিক-পাঠের সুষ্ঠু তরিকা উদ্ভাবন করেছেন।

কিন্তু এ কেবল নন্দনতত্ত্বের ব্যাপারও নয়। রোমান্টিক সাহিত্য-আন্দোলন তার নন্দনতাত্ত্বিক ঘোষণার আড়ালে বা ওই ঘোষণার মধ্যেই প্রবলভাবে রাজনৈতিক, ব্যাপকভাবে সমকাললিপ্ত এবং তৎপর। এর পেছনে জর্মন আলোকায়নপর্বের দর্শন এবং ফরাসি বিপ্লব যেমন সক্রিয় ছিল, ঠিক তেমনি গুরুতরভাবে কাজ করে গেছে ইংল্যান্ডের সমকাল। টেরি ইগলটন যেমন লিখেছেন, 'Most of the major romantic poets were themselves political acitvists, perceiving continuity rather than conflict between their literary and social commitments'.[২৯] তার মানেই হল, রবীন্দ্রনাথকে যদি রোমান্টিক কবি অভিধায় চিনতেই হয়, তাহলে তার স্থানিক পটভূমির সাথে মিলিয়ে বিশেষ স্বরূপও উদঘাটিত হওয়া চাই। বস্তুত উনিশ শতকীয় কলকাত্তাই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যেমন প্রবল ভূমিকা আছে, ঠিক তেমনি তার রূপ-স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিরও দায়-দায়িত্ব প্রবল। প্রাচ্যবাদীদের 'ভারত-আবিষ্কার' এই দুই আপাত-বিরোধী প্রবণতাকে মিলিয়েছিল এক সুতায়। জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা এক বর্ণাঢ্য অতীত-ভারতেই স্বস্তি মেনেছিল, আর ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়শাসিত তপোবনের নিশ্ছিদ্র সামঞ্জস্যেই মুক্তির সুরত তৈরি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ এ আকাঙ্ক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশক; আর তাঁর রোমান্টিক কল্পনাপ্রতিভা এই সূত্রেই সবচেয়ে গভীর তাৎপর্যে সাড়া দিয়েছিল। কালিদাসের ক্লাসিক বর্ণাঢ্যতায় তাঁর রোমান্টিক প্রবণতা এ কারণেই কোনো প্রতিবন্ধকতায় আটকা পড়েনি।

৭

পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মনে আছে, বহুকাল হল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। ... বেশ বুঝলুম, এ-সব কাব্য আমি যেরকম করে পড়লুম দ্বিতীয় আর-কেউ তেমন করে পড়ে নি।' পাঠ-তত্ত্বের দিক থেকে কথাটার তাৎপর্য গভীর। হাল আমলের 'পাঠক-প্রতিক্রিয়া তত্ত্ব' বা 'পাঠক গ্রহণতত্ত্ব' সম্ভবত এ ভাষায় কথাটা বলত। রবীন্দ্রনাথের জন্য পাঠ-তত্ত্বের এই প্রশ্রয় দরকার হয়নি। তিনি জানতেন, ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক উপলব্ধির এক বিস্তৃত পটভূমিতে তিনি কালিদাস পড়েছেন। জানতেন, ওই রচনাবলির সাথে তুমুল একাত্মতা তাঁর পাঠজনিত উপলব্ধিকে এমন বিশেষত্ব দিয়েছে যে, অন্যদের সাথে সে পাঠ মিলে যাওয়া অসম্ভব। তাঁর *মেঘদূত*-পাঠের যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে তাঁর মন্তব্যকে তত্ত্বজ্ঞানী পাঠকের প্রত্যয়ী উচ্চারণ হিসাবে না-ভেবে পারা যায় না।

তথ্যনির্দেশ

১. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, ২য় সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ১৪২

২. Ingalls, Daniel H. H., 'Kalidasa and the attitudes of the golden age', *Journal of the American Oriental Society*, Vol. 96, No. 1, USA, 1976, p. 19

৩. Basham, A. L., *The wonder that was India*, Fontana, 1971 [1954], p. 420

৪. উদ্ধৃত, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, *কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ: তুলনাত্মক সমীক্ষা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ৩

৫. Wilson, Horace Hayman, *The Megha Duta or Cloud Messenger: A Poem in the Sanscrit Language by Calidasa*, Calcutta, 1813, pp. vii-viii

৬. Rao, H. V. Nagaraja, 'A critical appreciation of *Meghaduta* according to dhani theory', *East west poetics at work*, edited by C. D. Narasimhaiah, Sahitya Akademi, Delhi, 1994, pp. 131-32

৭. Kale, M. R., *The Meghaduta of Kalidasa, text with Sanskrit Commentary of Mallinatha*, Motilal Banarsidass, Delhi, 1969, p. viii

৮. বুদ্ধদেব বসু, *কালিদাসের মেঘদূত*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২০

৯. Wilson, op. cit.

১০. Kale, M. R., *Kalidasa's Malavikagnimitram*, Reprint, Motilal Banarsidass, Delhi, 1999, p. xiii

১১. Gopal, Ram, *Kalidasa: His art and culture*, Concept publishing company, New Delhi, 1984, p. 103

১২. Roychowdhury, Krishna Chandra, 'Kalidasa's imagery in *Mehgaduta*', *Indian Literature*, vol. 19, No. 2, Sahityo Akademi, Delhi, 1976, 117

১৩. বুদ্ধদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫০; Rao, op. cit., p. 137

১৫. Roychowdhury, op. cit., p. 116

১৬. বুদ্ধদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০

১৭. Abrams, M. H., *A Glossary of Literary Terms*, 7th edition, Harcourt Asia Pte. Ltd, India, 1999, pp. 175-77

১৮. বুদ্ধদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

১৯. Beuve, Sainte, *Essays by Sainte Beuve*, Translated by Elizabeth Lee, Digitalized version, Walter Scott Ltd, London, 2007, pp. 3-4

২০. Calvino, Italo, *Why Read the Classics?*, Pantheon Books, New York, 1999

২১. পম্পা মজুমদার, *রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ১৪৬

২২. সৈয়দ আলী আহসান, *রবীন্দ্রনাথ: কাব্য বিচারের ভূমিকা*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৭৭

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

২৪. Ingalls, op. cit.

২৫. Roychowdhury, op. cit., p. 97

২৬. Ingalls, op. cit., pp. 22-23

২৭. Wordsworth, William, 'Preface to *Lyrical Ballads*', *English Critical Texts*, edited by D. J. Enright and Ernst De Chickera, Oxford University Press, India, 2003

২৮. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত

২৯. Eagleton, Terry, *Literary Theory: An Introduction*, 2nd edition, Blackwell Publishers, 1996, p. 17